কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৫

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৪

সূরা তাগাবুত ১১-১৮ আয়াত

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يُّؤۡمِنۡ بِاللّٰهِ يَهۡدِ قَلۡبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ

১১. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহর উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এখান থেকে ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে কথাগুলো পড়ার সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, এসব আয়াত যে সময়ে নাযিল হয়েছিল তা ছিল মুসলমানদের কঠোর বিপদ ও দুঃখের সময়। তারা মক্কায় বছরের পর বছর জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার পর নিজেদের সবকিছু ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। যেসব ন্যায় ও সত্যপন্থী লোক তাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের ওপরও দ্বিগুণ মুসিবত আপতিত হয়েছিল। একদিকে তাদেরকে আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের কাছে চলে আসা শত শত মুহাজিরকে সহায়তা দিতে হচ্ছিল। অপরদিকে ইসলামের শত্রু সমগ্র আরবের লোকজন তাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না- এ বিষয়টি সূরা আল হাদীদের ২২-২৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে ৩৯ থেকে ৪২ নম্বর টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যাও পেশ করেছি। যে পরিস্থিতিতে এবং যে উদ্দেশ্যে সেখানে এ কথাটি বলা হয়েছিল ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে একই উদ্দেশ্যে এখানেও তা পুনরায় বলা হয়েছে। এখানে যে সত্যটি মুসলমানদের হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য তা হচ্ছে, বিপদ-আপদ নিজেই আসে না। আর পৃথিবীতে কারো এমন শক্তিও নেই যে, সে যার ওপরে ইচ্ছা কোন বিপদ চাপিয়ে দেবে। কারো ওপর কোন বিপদ আসতে দেয়া না দেয়া সরাসরি আল্লাহর অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহর অনুমোদন সর্বাবস্থায় কোন না কোন বৃহত্তর কল্যাণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে হয় যা মানুষ জানে না বা বুঝে উঠতে পারে না।

কেউ আল্লাহর উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন- বিপদ-আপদের ঘনঘটার মধ্যেও যে জিনিস মানুষকে সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে পদস্খলন হতে দেয় না সেই একমাত্র জিনিসটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই সে এসব বিপদ-আপদকে হয় আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল মনে করে অথবা এসব বিপদ-আপদ দেয়ার ও দূর করার ব্যাপারে পার্থিব শক্তিসমূহকে কার্যকর বলে বিশ্বাস করে কিংবা সেসবকে এমন কাল্পনিক শক্তিসমূহের কাজ বলে মনে করে যাদেরকে মানুষের কুসংস্কারজনিত বিশ্বাস ক্ষতি ও কল্যাণ করতে সক্ষম বলে ধরে নিয়েছে অথবা তারা আল্লাহকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলে নিখাদ ও নির্ভেজাল ঈমানের সাথে মানে না। ভিন্ন ভিন্ন এসব ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে মানুষ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত সে বিপদ-আপদ বরদাশত করে বটে কিন্তু তারপরেই সে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তখন সেসব আস্তানায়ই মাথা নত করে, সব রকম আপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে নেয়। এ সময় সে যে কোন হীন কাজ ও আচরণ করতে পারে। সব রকম ভ্রান্ত কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহকে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে। অপরদিকে যে ব্যক্তি একথা জানে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার হাতেই সবকিছু। তিনিই এই বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসক। তাঁর অনুমোদনক্রমেই বিপদ-মসিবত আসতে এবং দূরীভূত হতে পারে। এই ব্যক্তির মনকে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ও আনুগত্য এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার 'তাওফীক' দান করেন। তাকে সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার শক্তি দান করেন। অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর পরিস্থিতিতেও তার সামনে আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভের আশায় আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে। অতি বড় কোন বিপদও তাকে এতটা সাহসহারা

করতে পারে না যে, সে সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাবে বা বাতিলের সামনে মাথা নত করবে কিংবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দরবারে তার দুঃখ-বেদনার দাওয়াই বা প্রতিকার তালাশ করবে। এভাবে প্রতিটি বিপদ মসিবতই তার জন্য অধিক কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কোন মসিবতই তার মসিবত থাকে না বরং পরিণামের দিক থেকে সরাসরি রহমতে পরিণত হয়। কেননা সে এই মসিবতে নিঃশেষ হয়ে যাক বা সফলভাবে উৎরিয়ে যাক--- উভয় অবস্থায়ই সে তার প্রভুর দেয়া পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এ বিষয়টিই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "মু'মিনের ব্যাপারটিই বড় অদ্ভূত। আল্লাহ তার জন্য যে ফায়সালাই করুন না কেন তা সর্বাবস্থায় তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। বিপদ-আপদে সে ধৈর্য অবলম্বন করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতা আসলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া আর কারো ভাগ্যেই এরূপ হয় না।"

আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত- পূর্বাপর প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতই ঈমানদার এবং সে কিরূপ ঈমানের অধিকারী? তাই তিনি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই সব হৃদয়-মনের অধিকারীকে হিদায়াত দান করেন যার মধ্যে ঈমান আছে এবং তার মধ্যে যে মর্যাদার ও প্রকৃতির ঈমান আছে সেই পর্যায়ের হিদায়াত তাকে দান করেন। অপর অর্থটি এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাঁর সেই মু'মিন বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি তাকে ঈমান গ্রহণের আহবান জানিয়ে এবং ঈমান গ্রহণের সাথে দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষাসমূহের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীতে কোন্ ঈমানদারের ওপর কি মসিবত চলছে আর কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে সে কিভাবে তার ঈমানের দাবীসমূহ পূরণ করছে তা তিনি জানেন। তাই এ বিষয়ে আস্থা রাখো যে, আল্লাহর অনুমোদনক্রমে যে মসিবতই তোমাদের ওপর আসুক না কেন আল্লাহর কাছে তার বৃহত্তর কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে এবং তার মধ্যে বৃহত্তর কোন কল্যাণ লুক্কায়িত আছে। কেননা, আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দার কল্যাণকামী। তিনি তাদেরকে বিনা কারণে বিপদে ফেলতে চান না।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

১২. আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা করার আদেশ করেছেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেনঃ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, (তবে জেনে রেখো যে,) আমার রাসূল (সঃ)-এর দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। অর্থাৎ যদি তোমরা মান্য না কর তবে তোমাদের আমলের জন্যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) মোটেই দায়ী হবেন না। তাঁর দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেয়া এবং তাঁর এ দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। এখন তোমাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

১৩. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; আর আল্লাহর উপরই মুমিনগণ যেন তাওয়াক্কুল করে।

সর্বময় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তা' আলার হাতে। এই ক্ষমতা ও ইখতিয়ার অন্য কারো আদৌ নেই। তাই সে তোমাদের জন্য ভাল বা মন্দ ভাগ্য গড়তে পারে না। তিনি আনলেই কেবল সুসময় আসতে পারে এবং তিনি দূর করলেই কেবল দুঃসময় দূর হতে পারে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে মনে-প্রাণে একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করে সে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং একজন ঈমানদার হিসেবে এই বিশ্বাস রেখে দুনিয়াতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকবে যে, আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন কেবল সে পথেই কল্যাণ নিহিত। এছাড়া তার জন্য আর কোন পথ নেই। এ পথে

সফলতা লাভ হলে তা আল্লাহর সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফিকের মাধ্যমেই হবে; অপর কোন শক্তির সাহায্যে তা হওয়ার নয়। আর এ পথে যদি কঠোর পরিস্থিতি, বিপদাপদ, ভয়ভীতি ও ধ্বংস আসে তাহলে তা থেকেও কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী-স্বামী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর যদি তোমরা তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ আয়াতের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ অনুসারে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে, স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে এবং পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সেই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। ঈমান ও সত্য সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে একে অপরের পুরোপুরি বন্ধু ও সহযোগী হতে পারে একজন স্বামীর এরূপ স্ত্রী, একজন স্ত্রীর এরূপ স্বামী লাভ করা এবং আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও চরিত্রের দিক দিয়ে সকল সন্তান-সন্ততিই চোখ জুড়ানোর মত হওয়া, পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে থাকে। বরং সাধারণত দেখা যায় যে, স্বামী যদি নেককার ও ঈমানদার হয় তাহলে সে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লাভ করে থাকে যারা তার দ্বীনদারী, আমানতদারী এবং সততাকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। তারা চায় যে, তাদের স্বামী ও পিতা তাদের জন্য জাহান্নাম খরিদ করুক এবং হালাল ও হারামের বাছবিচার না করে যে কোন পন্থায় আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফূর্তি এবং গোনাহ ও পাপের উপকরণ এনে দিক। কোন কোন সময় আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটে থাকে। একজন নেক্কার ঈমানদার নারীকে এমন স্বামীর পাল্লায় পড়তে হয় যে স্ত্রীর শরীয়াত অনুসারে জীবন যাপন দুই চোখে দেখতে পারে না। আর সন্তানরাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের গোমরাহী ও দুষ্কর্ম দ্বারা মায়ের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় যখন একজন মানুষের ঈমান দাবী করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের জন্য সেই ক্ষতি স্বীকার করবে, দেশ ছেড়ে হিজরত করবে কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করবে তখন তার পথে তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনই সর্বপ্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলমানের জন্য যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল এবং কোন অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য আজও দেখা দেয় এ আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থটি সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। সেই সময় মক্কা মুয়াযযমা ও আরবের অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যে, একজন লোক ঈমান এনেছে কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় শুধু তাই না বরং তারা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট। যেসব মেয়েরা তাদের পরিবারে একাকী ইসলাম গ্রহণ করতো তাদের জন্যও ঠিক একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো।

যেসব ঈমানদার নারী ও পুরুষ এ দু'টি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন তাদের উদ্দেশ্য করে তিনটি কথা বলা হয়েছেঃ
সর্বপ্রথম তাদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পর্কের দিক দিয়ে যদিও তারা মানুষের অতি প্রিয়জন কিন্তু দ্বীন ও আদর্শের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'দুশমন'। তারা তোমাদের সৎকাজে বাধা দেয় এবং অসৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, কিংবা তোমাদের ঈমানের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কুফরীর পথে সহযোগিতা করে কিংবা তারা কাফেরদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে মুসলমানদের সামরিক গোপণ তথ্য সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট থেকে যাই জানতে পারে তা ইসলামের শত্রুদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। এর যে কোন পন্থায়ই তারা দুশমনী করুক না কেন তাদের দুশমনীর ধরণ ও প্রকৃতিতে অবশ্যই পার্থক্য হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা দুশমনী। ঈমান যদি তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সেই বিচারে তাদেরকে দুশমনই মনে করতে হবে। তাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে এ বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফর বা আনুগত্য ও অবাধ্যতার প্রাচীর আড়াল করে আছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকো। অর্থাৎ তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্য নিজেদের পরিণাম তথা আখেরাতকে বরবাদ করো না। তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসাকে এতটা প্রবল হতে দিও না যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতটা বিশ্বাস ও আস্থা রেখো না যাতে তোমাদের অসাবধানতার কারণে মুসলমানদের দলের গোপনীয় বিষয়সমূহ তারা অবগত হয়ে যেতে পারে এবং তা দুশমনদের হাতে পৌঁছে যায়। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে এ বিষয়টি সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে,

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتَهُ- "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। বলা হবে, তার সন্তান-সন্ততিরা তার সব নেকী ধ্বংস করে ফেলেছে।"

সর্বশেষ বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এর অর্থ হলো, তাদের শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু এই জন্য যে, তোমরা সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের আদর্শকে তাদের থেকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করবে। এই সতর্কীকরণের অর্থ কখনো এ নয় যে, যা করতে বলা হলো তার চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে তোমরা স্ত্রী ও সন্তানদের মারতে শুরু করবে অথবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে অথবা সম্পর্ক এমন তিক্ত করে তুলবে যে, তোমাদের এবং তাদের পারিবারিক জীবন আযাবে পরিণত হবে। কারণ এরূপ করার দু'টি স্পষ্ট ক্ষতি আছে। একটি হলো, এভাবে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সংশোধনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়টি হলো, এভাবে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে উল্টা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এভাবে আশেপাশের লোকদের দৃষ্টিতে মুসলামানদের আখলাক ও চরিত্রের এমন একটি চিত্র ভেসে উঠে যাতে তারা মনে করতে শুরু করে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সে নিজের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য পর্যন্ত কঠোর ও বদমেজাজী হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ যখন সবেমাত্র মুসলমান হতো এবং যদি তাদের পিতামাতা কাফেরই থেকে যেত তাহলে একটি সমস্যা দেখা দিত এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে নতুন দ্বীন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতো। তাদের জন্য আরো একটি সমস্যা দেখা দিতো তখন যখন তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা (কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং সন্তানরা) কুফরকেই আঁকড়ে ধরে থাকতো এবং সত্য দ্বীনের পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতো। প্রথমোক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সূরা আনকাবূতের (১৮ আয়াত) এবং সূরা লোকমান(১৪ ও ১৫ আয়াত) --এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কখনো পিতামাতার কথা অনুসরণ করবে না। তবে পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। এখানে দ্বিতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের দ্বীনকে নিজের সন্তান-সন্ততির হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করবে কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না। বরং নমনীয় আচরণ করো এবং ক্ষমা ও উদারতা দেখাও।

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

যে জিনিসটি সাধারণত মানুষের ঈমানী চেতনায় এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং যে জন্য মানুষ প্রায়ই মুনাফেকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানতে লিপ্ত হয় সেটি হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থের প্রতি সীমাতিরিক্ত আগ্রহ। এ কারণে বলা হয়েছে, এ অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে অন্ধ হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও। অথচ এগুলো তো আসলে দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহে তোমাদের জন্য পরীক্ষার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে তোমরা পুত্র বা কন্যা বলে জানো, প্রকৃতপক্ষে সে তো পরীক্ষার একটি বিষয়। আর যাকে তোমরা

সম্পত্তি বা ব্যবসা বলে থাকে, সেও প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার আর একটি বিষয় মাত্র। এ জিনিসগুলো তোমাদের হাতে সোপর্দ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা অধিকার ও দায়-দায়িত্বের প্রতি কতদূর লক্ষ্য রেখে কাজ করো, দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে আবেগতাড়িত হয়েও কতদূর সত্য ও সঠিক পথে চলা অব্যাহত রাখো এবং পার্থিব বস্তুর প্রেমাসক্ত নফসকে কতদূর নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরোপুরি আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও এবং আল্লাহ তাদের যতটুকু অধিকার নির্ধারণ করেছেন ততটুকু আদায়ও করতে থাকো, এগুলোর মাধ্যমে তা যাচাই করে দেখা হবে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

১৬. সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়; তারাই তো সফলকাম।

কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা হয়েছে اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ "আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করো।" (আলে ইমরান, ১০২) অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (আল বাকারাহ, ২৮৬) এখানে বলা হচ্ছে, সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এ তিনটি আয়াতের বিষয়বস্তু এক সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, প্রথম আয়াতে আমাদের সামনে একটি মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় আয়াত আমাদেরকে এই মৌলিক নীতি অবহিত করছে যে, কোন ব্যক্তির নিকট থেকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজ দাবী করা হয়নি। বরং আল্লাহর দ্বীনের অধীনে মানুষ ততটুকুই করার জন্য আদিষ্ট যা করার সামর্থ তার আছে। আর এ আয়াতটি প্রত্যেক ঈমানদারকে এ মর্মে পথনির্দেশনা দিচ্ছে যে, সে যেন সাধ্যানুসারে তাকওয়ার পথ অনুসরণে কোন ত্রুটি না করে। তার পক্ষে যতটা সম্ভব আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। এক্ষেত্রে সে যদি অলসতা করে তাহলে পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবেনা। তবে যে জিনিস তার সাধ্যের অতীত (অবশ্য কোন্ জিনিস তার সাধ্যের অতীত তার ফায়সালা আল্লাহই ভালভাবে করতে পারেন) সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত হয়ে যাও। তাদের আনুগত্য হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক হয়ো না। আগেও বেড়ে যেয়ো না এবং পিছনেও সরে এসো না। আর আল্লাহ তা' আলা তোমাদেরকে যা দিয়ে রেখেছেন তা হতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ফকীর-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান করতে থাকো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে ইহসান করেছেন ঐ ইহসান তোমরা তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি করে যাও। তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি এটা না কর তবে দুনিয়ার ধ্বংস তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে আনবে।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু।

এটা আল্লাহ তা'আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তার পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্জে হাসানা" (উত্তম ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নাম-ধামের আকাংখা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ্য হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুইটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি

হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই এটাকে বাস্তবে রুপান্তরিত করেছিলেন।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

১৮. তিনি গায়েব ও উপস্থিত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ফুটনোট

➢ বিপদ আপদ ও দুর্বিপাকে মানুষকে যে বিষয়টি স্থির ও অবিচল রাখতে পারে তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। ঈমানদার ব্যক্তি জানেন যে, আল্লাহ তাঁর অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত কাজেই বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তিনিই তাকে মুক্তি দেবেন।

➢ নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু মানুষকে বাধ্য করা তাদের দায়িত্ব নয়। কারণ, মানুষকে আল্লাহ স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আল্লাহর আনুগত্য করা কিংবা আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা রয়েছে।

➢ প্রকৃত ঈমানের চিহ্ন হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। মুমিন ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিটি কাজে আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে হবে।

➢ পারিবারিক বন্ধন যেন আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। পরিবারের প্রতিটি সদস্য আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। তাদের সবাইকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে হবে।

➢ মানুষকে আল্লাহ যেসব উপকরণ দ্বারা পরীক্ষা করেন তার অন্যতম হচ্ছে পরিবার ও সন্তান-সন্ততি। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা অনেক। এসব চাহিদা ততক্ষণ পর্যন্ত মেটাতে হবে যতক্ষণ তা আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়।

➢ সম্পদ ও সন্তানদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা মানুষকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে।

➢ তাকওয়া এবং খোদাভীতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যেকোনো সময় এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কোনো কাজ করা যাবে না। গোনাহ যত ছোট হোক তা করা যাবে না এবং নেক কাজ যত ছোট হোক তা ছাড়া যাবে না।

➢ মানুষের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের ওপর। মন যা চায় তা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত হলে করা যাবে না।

➢ ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তি মানুষকে কৃপণতার দিকে ঠেলে দেয়। পক্ষান্তরে ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে মানুষ সফলকাম হতে পারে।

➢ মহান আল্লাহ অসহায় মানুষদের পক্ষে রয়েছেন। তিনি তাদেরকে দান করা অর্থকে নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দানকারী ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেন।

- আমরা আল্লাহর সৃষ্টি এবং আমাদের যা কিছু আছে তা তাঁরই দান। কিন্তু তারপরও আমরা যে দান-খয়রাত করি সেজন্য আল্লাহ নিজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

- মানুষকে ঋণ দান আল্লাহকে ঋণ দানের সমান। তাই যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করছে তার কাছ থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার আশা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ নিজেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

- গোপনে দান করা এমনকি যাকে দান করা হলো তাকেও বিষয়টি জানতে না দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম দান। আল্লাহ বলেছেন, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়েই অবগত আছেন।